ওঁ সহনা ভবতু সহনৌ ভুনক্তু সহবীর্য্যং করবাবহৈ।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ....

মাননীয় সভাপতি, মান্যবর বিচারপতি পিনাকী চন্দ্র ঘোষ, এই সমাবর্তনের প্রধান অতিথি অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, সহ-উপাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, স্বামী দিব্যানন্দ, সচিব, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দিরের অধ্যাপকমণ্ডলী, স্নাতকবৃন্দ, আমন্ত্রিত সজ্জনমণ্ডলী ও প্রচারমাধ্যমের প্রতিনিধিরা।

আজ এই সমাবর্তনে যে-সব তরুণ বিদ্যার্থী শিক্ষাজীবনের সোপান গৌরবের সঙ্গে পেরিয়ে যাচ্ছেন তাদেরে অভিনন্দন জানাই। আমাদের জীবন অন্তহীন পথ পরিক্রমার আরেক নাম। বস্তুত কৃতিত্বের সঙ্গে পথ চলতে পারার আনন্দ গন্তব্যে পৌঁছানোর চেয়ে কোনো অংশেই কম গৌরবজনক নয়। এতদিন বিদ্যায়তনের গণ্ডিতে তারা সীমিত ছিলেন, এ বার এসেছে বিশ্বময় ছড়িয়ে যাওয়ার পালা। বিশ্বসাথে যোগে যখন বিহার করি, পরম সত্তার সঙ্গে তখনই প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু তা নির্জনে নয়, অপেক্ষমান দেশ ও সমাজের মাঝখানে। কিংবা আরও একটু এগিয়ে, মানবসভার মাঝখানে। কর্মে, জ্ঞানে, ধ্যানে যখন পরমতার উদ্ভাসন ঘটে, প্রকৃত সত্য নিজেকে নিজেই প্রকাশ করে। প্রাচীন যুগের ঋষিদের মুখে এজন্যেই আমরা শুনেছি ; 'আবীরাবীর্মেধি'। হে স্বপ্রকাশ তুমি আমার কাছে আবির্ভূত হও, এই আকাঙক্ষা যখন সার্থকভাবে ব্যক্ত হয়, নানাভাবে জীবন পুষ্পিত হতে শুরু করে। এই সমাবর্তনে আজ যাঁরা স্নাতক হলেন, এখন থেকে প্রতিদিনই এই সত্য তাদের কাছে ধরা দিতে থাকুক।

ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে অসামান্য বাণী উচ্চারিত হয়েছিল, সেই চরৈবেতি অর্থাৎ চলো চলো, নিরন্তর চলো— চলার বার্তা স্নাতকদের জন্যে সর্বদা প্রাসঙ্গিক থাকবে, এই আশা ব্যক্ত করছি।

'চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদম্বরম্। সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রায়তে চরংশ্চরৈবেতি চরৈবেতি।।' অর্থাৎ 'চলতে চলতে মধু লাভ হয়, চলতে চলতে আকাশ আস্বাদ্য হয়ে ওঠে। সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখো, হে শ্রেয়পথিক, চলতে চলতে সে কখনও তন্দ্রাগ্রস্ত হয় না। তাই চলো, চলো।' এই মন্ত্র থেকে উৎসারিত বোধ আজও আমাদের প্রাণিত করে কেন? নিরন্তর পরিবর্তনের অভিঘাতে আমাদের পরিচিত পৃথিবী ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। অথচ নতুন পৃথিবী জন্ম নিচ্ছে না। বহু সংগ্রাম ও তিতীক্ষার পরে মর্মান্তিক দেশভাগের মধ্য দিয়ে যে-স্বাধীনতাকে আমরা পেয়েছি, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমাজ-পুনর্নির্মাণের স্বপ্ন এবং নতুন বাস্তবের উপযোগী নতুন মানুষ নির্মাণের প্রকল্প এখনও অনেকটা অধরা রয়ে গেছে। তাছাড়া বহির্পৃথিবীর আর্থ-রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অভিঘাতে আমাদের বহমান পরম্পরা সম্পর্কেও দেখা দিয়েছে দুর্ভাগ্যজনক উদাসীনতা। বিশ শতকের শেষ তিনটি দশকে ভাঙনের নানা চেহারা ও চরিত্র আমরা দেখেছি। একুশ শতক ও তৃতীয় সহস্রাব্দের সূচনার প্রথম দশকও অতিক্রান্ত। বিশ্বায়নের জোরালো প্রভাবে বহু নেতিবাচক প্রবণতা হয়ত বা আমাদেরই আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছে। নতুন দশকের প্রথম বছরে আয়োজিত এই সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে যুগ-সন্ধিক্ষণের জটিল আবহে। কিন্তু এখনই প্রকৃত সময় ফিরে তাকানোর, গভীরতর আত্ম-জিজ্ঞাসার, সচেতন আত্ম-বিনির্মাণের।

আজকের এই সমাবর্তনে যারা স্নাতক হচ্ছেন, তাঁদের জন্যে তাই অপেক্ষা করে আছে অনন্বয়-কূটাভাসে ঈষৎ বিভ্রান্ত অথচ বিপুল সম্ভাবনাময় এক নতুন পৃথিবী। আমি আহ্বান করছি, তরুণ-তরুণীরা এই নতুন পৃথিবীর স্থপতি হয়ে উঠুন। আর তাঁদের উদ্যমে ও শুশ্রূষায় রুগ্ন সমাজ নতুন বিশল্যকরণী লাভ করুক। মিথ্যার কুহেলিকা করি উদ্ঘাটন, তাঁদের জীবনের সম্ভাবনা জ্যোতির্ময় সূর্যের মতো প্রকাশিত হোক, কেননা, আমাদের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি দার্শনিক অধ্যাপক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মন্তব্য অনুযায়ী 'The darkest hour of the night is the hour before dawn'। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, রাত্রির সবচেয়ে অন্ধকার প্রহর-ই ভোরের পূর্ব-মুহূর্ত। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের মহান দেশ আমাদের। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনাই করে এসেছেন আমাদের সন্তপুরুষেরা, ভাবুকেরা। যুগে যুগে এই বার্তাই দিয়ে গেছেন তাঁরা যে নানান বরণ গাভী হলেও একই বরণ দুধ। সংহতির সাধনায় আমরা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য খুঁজেছি। 'চারিদিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি / ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি' কীভাবে একটি নতুন ভোর অপেক্ষা করে আছে আমাদের তরুণ-তরুণীদের জন্যে। শুধুমাত্র জানতে হবে,

মানুষের সামর্থ্য অন্তহীন। খনন করে যেতে হবে নিজেকেই। মন্ত্র একটাই : 'আত্মানং বিদ্ধি'। নিজেকে জানি যখন, জগৎকে জানি তখনই। আমাদের অন্বিষ্ট হোক সার্বিক মানবিক উৎকর্ষ, লাতিন ভাষায় 'Excelsior'। উৎকর্ষের যাত্রায় আরম্ভ আছে, শেষ নেই কোনও। যাত্রাপথের বদল ঘটে, ঘটতে পারে; তবু যাত্রা থামে না। সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও মলিনতার হিংস্র আয়োজন উপেক্ষা করে, জেগে থাকতে হবে নিজে, জাগিয়ে রাখতে হবে অপরকে। স্বামীজির বড় প্রিয় ছিল উপনিষদের এই বাণী : 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'। এই বাণী অনুরণিত হোক প্রত্যেক স্নাতকের মননে ও অনুভবে। তবেই আমরা ঐতিহ্যগ্রাসী সাম্প্রতিকের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারব। আমাদেরে রুদ্ধ করার দৃশ্য ও অদৃশ্য চক্রান্ত পরাভূত হবে।

আমরা জানি, গত কয়েক বছরে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমূল রূপান্তর সূচিত হয়েছে। শিক্ষার উপকরণ ও অন্তর্বস্তু এমনভাবে নতুনকালের উপযোগী হয়ে উঠতে চাইছে যে প্রচলিত শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপ্রণালীর ধারণা দিয়ে তার মোকাবিলা করা যাচ্ছে না। জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে শিক্ষক বিদ্যার্থীদের চক্ষু উন্মীলন করে গুরুর মর্যাদা পেতেন। যন্ত্র প্রযুক্তির সর্বাত্মক উপস্থিতির দাপটে সেই শিক্ষকের প্রয়োজন হয়ত বা ফুরিয়ে যাবে। আমাদের হাজার বছরের সংস্কার বিপর্যস্ত হলে কী কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তা সম্ভবত এখন পর্যন্ত আমরা ভালভাবে ভেবে দেখিনি। বিশ্বায়নের নামে যে-বাণিজ্যিকীকরণ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কার্যত অজগর সাপের মতো গ্রাস করে চলেছে, তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষক ও বিদ্যার্থী সম্পর্ক অদূরভবিষ্যতে কী দাঁড়াবে, তা ভাবতেও শঙ্কা বোধ করি। ঠিক কথা, বুনো রামনাথ আজ কিংবদন্তি মাত্র। ইচ্ছে করলেও আর আমরা গুরুর আশ্রমে শান্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পারব না। আন্তর্জাতিকীকরণের প্রক্রিয়া গত এক-দু'বছরে ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই পংক্তি-ভোজনে সবার ঠাঁই মিলবে বলে মনে হয় না। তার মানে, ভারতের নানা প্রান্তে সুবিধাভোগী ও সুবিধা থেকে বঞ্চিত নিষ্ফলের হতাশের দলের মধ্যে ব্যবধান উৎকটভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যাদের অনেক আছে, তারাই বাইরের পৃথিবীতে যুক্ত হওয়ার ছাড়পত্র আদায় করে নেবে। আর যাদের কিছুই নেই, তারা উল্টো রথের টানে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে থাকবে। এরফলে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বৈষম্য তীব্র গতিতে বাড়তে থাকবে কি না, এর উত্তর আগামী কয়েক বছরে আমরা নিশ্চয়ই পেয়ে যাব।

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির প্রলম্বিত ছায়া থেকে কতখানি মুক্ত হতে পেরেছে, কয়েক বছর আগেও এই বিতর্ক অব্যাহত ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী ছয় দশকে আমরা কার্যত পেরিয়ে এসেছি অন্তবিহীন পথ। পৃথিবীর বৃহত্তম এই গণতান্ত্রিক দেশে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী পঞ্চান্ন কোটি তরুণ-তরুণীরা নতুন জীবনের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। এই সময়ের নীতি-নির্ধারকেরা যুবশক্তিকে নতুন মানব সমাজ গড়ার লক্ষ্যে অমূল্য মানবপুঁজি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেবলমাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চাকে আরও শাণিত করার জন্যেই নয়, মানবিকীবিদ্যার সুষম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের কথাও তাঁরা বলতেন। তবু বাস্তব সম্ভবত এই যে আমাদের মধ্যে অনেকেই মানবিকীবিদ্যার গুরুত্ব সম্পর্কে ঈপ্সিত মাত্রায় সচেতন নন। তাই যেসব বিদ্যায়তন এ-সময়ে ঐতিহ্য ও পরম্পরার পতাকাকে শক্ত মুঠোয় ধরে রেখেছেন, তাঁদেরে অভিবাদন জানাতেই হয়। আজকের সমাবর্তন তাই আমাদের কাছে আলাদা গুরুত্ব দাবি করে। অন্ধকার যত গাঢ় থাকে, আলোকশিখার প্রয়োজন তত বেশি অনুভূত হয়। দর্পণ স্বচ্ছ না হলে তাতে প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠে না। স্পষ্টতই এ-সময়ে কাজটি খুব সহজ নয়। তবু এই দুরূহের ব্রত সাধনা অব্যাহত রয়েছে, এটাই ভরসার কথা। বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রে থাকবে মানুষ, অনেক পুরনো এই কথাটাই জোরের সঙ্গে বারবার উচ্চারণ করা দরকার। তথাকথিত আধুনিকোত্তর পর্যায়ে সমস্ত বৈচিত্র্য যখন নির্বাসিত, ভারতের মতো দেশে বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও নতুন নতুন ধরনে তার উদ্দীপন-ই হতে পারে প্রতিরোধের আয়ুধ। গ্রামে-গাঁথা দেশ আমাদের, বহু কোটি মানুষ আজও দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়েছেন। তাঁদের শিক্ষার প্রয়োজন কখনও আমদানি করা চিন্তা-কাঠামো মেটাতে পারে না। শিক্ষা-প্রাপকদের মধ্যে যাঁরা বৌদ্ধিক বর্গের চাহিদা অনুযায়ী তৈরি করা শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ পাবেন, তাঁদের জীবনযাপন ও জীবিকা সংস্থান অতি দ্রুত এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, যেখান থেকে খুব কাছের পরিসরকেও ঝাপসা বলে মনে হবে। মধ্যবর্গীয়দের জীবন ও জীবিকার প্রশ্ন কি একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় মীমাংসিত হতে পারে? নিশ্চয়ই ১২১ কোটি মানুষের জন্যে সমাধান একই রকম হতে পারেনা। কিন্তু সমস্ত নিরিখে যাঁরা মধ্যবর্গীয়দেরও নিচে অবস্থান করেন,

আন্তর্জাতিকীকরণের উৎসাহে সেই গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের জীবন-জীবিকার উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার কথা আমরা কি ভাবব না? সমৃদ্ধ দেশের সুবিধাভোগী জনদের কাছে সময় যে- তাৎপর্য বয়ে এনেছে, অজস্র বৈষম্যপীড়িত বর্গের সহাবস্থানে জটিল ভারতের মতো দেশে সময়ের কোন্ তাৎপর্য ধরা পড়ে? এইসব জিজ্ঞাসা আমাদের নিশ্চয় উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্যে উদ্যমী করে তুলবে, এই বিশ্বাস করতেই হয়। কেননা, সমস্ত কথাই মানুষকে নিয়ে। আর মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ।

নবীন স্নাতকদেরে আমি শুধু মনে করিয়ে দেব রবীন্দ্রনাথের সেই অসামান্য গানের পঙ্‌ক্তিটি : 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া /বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া'। তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে এমন এক পৃথিবী যা তোমরাই তৈরি করবে তোমাদের নিষ্ঠা দিয়ে, একাগ্রতা দিয়ে, নিরন্তর চেষ্টা দিয়ে, মনন ও হৃদয় দিয়ে। আজকের দুনিয়ায় হৃদয়ের বড় ঘাটতি দেখা যায়। যে আদর্শে দীক্ষিত হয়ে তোমরা স্নাতক হয়েছ আজ, সেই আদর্শই হোক তোমাদের ধ্রুবতারা আর অবিচল দীপরক্ষী। নিজেদের মানব-স্বভাব ও মানব-সত্য থেকে যেন কখনো তোমাদের বিচ্যুতি না হয়। 'যানি অনবদ্যানি কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যানি অস্মাকং সূচরিতানি। ত্বয়োপাস্যানি'। অর্থাৎ মঙ্গলজনক চিন্তা ও কাজ থেকে তোমাদের যেন কখনো বিচ্যুতি না হয়। যে-সব কাজ অনিন্দিত, সারা জীবন ধরে সেইসব করতে থাকো। অন্য কিছু নয়। যা কিছু আমাদের সু-সংস্কৃতি, সেইসব কায়মনবাক্যে অনুসরণ করো। আজকের সমাবর্তন সার্বিক মঙ্গলের জন্যে এই অনুশাসন তোমাদের দিচ্ছে। এই তোমাদের জীবন-ব্যাপ্ত তপস্যা ও উপাসনা। তোমাদের মঙ্গল হোক।

'শ্রেয়াস্তে সন্তু পন্থানঃ'।

— অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য
উপাচার্য
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর